লেফটেন্যান্ট (অন.) আব্দুল হাই ভূঁঞা বিএন (অব.)

# স্বাধীনতাযুদ্ধে রণতরী পলাশ ও পদ্মার অবদান

১৯৭১ সালে তরুণ বয়সে একদিন একটি স্বাধীন ভূমির স্বপ্নে বিভোর হয়ে পাকিস্তান নৌবাহিনীর শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতাযুদ্ধে রক্ত ঝরিয়েছিলাম। একদিন সেই দেশ স্বাধীন হলো। স্তব্ধ হলো গোলাবারুদের শব্দ। মানুষ বেরিয়ে এলো লাল সূর্যের পতাকা নিয়ে তমসাচ্ছন্ন বিবর থেকে। তারপর সময়ের আবর্তে কখন যে সেই সোনালি দিনগুলো পেছনে ফেলে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছি, টেরই পাইনি। আজ পেছনে ফিরে দেখি সবই ঝাপসা। দিন যত যাচ্ছে স্মৃতি ততই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। তাই মাঝেমধ্যে ভাবি, জানা কথাগুলো তো একদিন আমার সঙ্গে হারিয়ে যাবে। ঘটনাচক্রে ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে নিজেকে ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছি। তাই যখন দেখি নিজের জানা কথাগুলো অন্যরা ভিন্নভাবে বলছেন, আশঙ্কা হয় কখনো বা কোনো গবেষক বা লেখকের কাছে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসে আমাদের ইউনিটের অস্তিত্বই না হারিয়ে যায়। এমনই এক ধাক্কা খেয়েছিলাম ১৮ জুলাই ১৯৯৩ সালে ভোরের কাগজে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণাবিষয়ক লেখায় শ্রদ্ধেয় নৌ কমান্ডো খলিলুর রহমানের রচনা পড়তে গিয়ে। তিনি নৌ কমান্ডো গ্রুপ $C_2P$-এর সদস্য ($C_2$ পলাশী) ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, এক অপারেশনে তাঁদের গ্রুপ বনলক্ষ্মী ও বনসুন্দরী নামের দুটি ফরেস্ট বোট আটক করেছিল। পরে ওই বোট দুটিই পদ্মা ও পলাশ নামে বিখ্যাত হয়েছিল। তিনি ফরেস্ট বোটগুলো দেখেছিলেন। কিন্তু পদ্মা ও পলাশ আদৌ চাক্ষুষ করেননি। কারণ পদ্মা ও পলাশ ছিল আরেকটি কমান্ডো গ্রুপের $C_2H$ ($C_2$ হলদিয়া) নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু আমার সৌভাগ্য হয়েছিল উভয় ক্ষেত্রে কাজ করার। অর্থাৎ আমি বনলক্ষ্মী ও বনসুন্দরীকেও দেখেছি এবং পদ্মা ও পলাশকেও দেখেছি।

পদ্মা ও পলাশ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম সমুদ্রগামী রণতরী। স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসে এ দুটি রণতরীর অনন্যকার্য ভূমিকা রয়েছে, সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ বিষয়ে পরে বলব। কথা হলো, এ দুটি গানবোট খলিলুর রহমানের উল্লিখিত বনলক্ষ্মী ও বনসুন্দরী নয়। বনলক্ষ্মী ও বনসুন্দরী ছিল ছোট ফরেস্ট পরিদর্শন বোট, মাত্র তিন অথবা চারজন ক্রু ছিল। অন্যপক্ষে পলাশ ও পদ্মা ছিল Ocean Going Tug, গভীর সমুদ্রেও চলাচলের উপযুক্ত। আর প্রতিটিতে ২৬ জন করে আমরা মোট ৫২ জন নৌ সেনা অংশ নিয়েছিলাম। ৯ নম্বর সেক্টর হেডকোয়ার্টার চব্বিশ পরগনা জেলার টাকি হাসনাবাদে বনলক্ষ্মী ও বনসুন্দরী এবং আরো দুটি একই ধরনের বোট বনরানী, বনবালাসহ মোট চারটি বোট নিয়ে ছোট একটি নৌ ইউনিট গড়ে উঠেছিল। এগুলোর নতুন নাম দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু, বঙ্গশক্তি ও একই ধরনের আরো দুটি নাম। এখন আর মনে নেই। স্বাধীনতার পর ওগুলোর কথা বলতে গিয়ে কেউ কেউ ওই বোটগুলোকে বঙ্গবন্ধু ফ্লিট বলতেন। ওগুলো সম্পূর্ণভাবে ৯ নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল। টাকা-পয়সা, রসদ—সব কিছু ওই সেক্টর থেকে আসত। আর কখনো কখনো ওই বোটগুলো ৯ নম্বর সেক্টরের অ্যাডভান্স গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ, রসদ সরবরাহ এবং মুক্ত এলাকায় প্যাট্রলে বের হতো। অন্যদিকে পলাশ ও পদ্মা সম্পূর্ণ ভিন্ন ইউনিট ছিল, শুধু তাদের শেষ অপারেশনে হাসনাবাদের এই ইউনিটটিকে মাদারবেইজ হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এখান থেকে মংলা দখলের জন্য যাত্রার প্রাক্কালে দুজন বর্ষীয়ান সিনিয়র নৌ সেনা চিফ রাইটার আতাউল হক ও মাস্টার অ্যাট আর্মস এম এ কুদ্দুসকে রেখে গিয়েছিল। আতাউল হক স্বাধীনতার পর লেফটেন্যান্ট হয়েছিলেন এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভিত্তি স্থাপনে অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। হাসনাবাদ ইউনিটের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন পাকিস্তান নৌবাহিনীর দুর্ধর্ষ কমান্ডো লিডিং সিম্যান বেগ। তিনি ওই সময় ক্যাপ্টেন বেগ নামে সুপরিচিত ছিলেন। সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলের একজন সহযোগী কর্মকর্তা হিসেবে বিভিন্ন সামরিক অপারেশনে অংশ নিতেন। তাঁর সঙ্গে আরো ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি আলোড়ন সৃষ্টিকারী স্টুয়ার্ড মুজিবর রহমান, ডুবুরি সোলতান আহমদ ও নূর মোহাম্মদ। এই দুজনও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি ছিলেন। আর ইউনিটের ইনচার্জ ছিলেন চিফ ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার এম এস আলম। তিনি লেফটেন্যান্ট আলম নামে পরিচিত ছিলেন। স্বাধীনতার পর অবশ্য লে. হিসেবে কমিশন পেয়েছিলেন।

'পলাশ' আর 'পদ্মা' সম্পর্কে তথ্যের অভাবে শুধু যে খলিলুর রহমান ভুল করেছিলেন, এমন নয়। মেজর (অব.) কামরুল হাসান ভূঞাও ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ সালে দৈনিক জনকণ্ঠে এক লেখায় 'পলাশ', 'পদ্মা'কে কলকাতা পোর্ট কমিশনের টাগবোট অজয়, অক্ষয় বলে উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য তিনি এ বিষয়ে মতানৈক্যের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। আসলে অজয়, অক্ষয় ছিল ব্রিটিশ ফোর্ড ক্লাস মডেলে ১৯৬২ সালে কলকাতায় তৈরি ভারতীয় নৌবাহিনীর 'অক্ষয় ক্লাস (Class)' লার্জ প্যাট্রল বোটের অন্তর্ভুক্ত।

'পলাশ' ও 'পদ্মা' ছিল কলকাতা বন্দরের দুটি ওশান গোয়িং টাগবোট। পলাশ, পদ্মা, পারুল ও পারিজাত নামের একই ধরনের চারটি টাগবোট ছিল। পর্যায়ক্রমে এ চারটিকেই কনভার্ট করে গানবোট করার লক্ষ্য ছিল। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার নগদ অর্থে, কারো কারো মতে ৬০ লাখ রুপি দিয়ে এ দুটিকে ক্রয় করে। কলকাতার মেটিয়াবুরুজের বিখ্যাত গার্ডেন রিচ ওয়ার্কশপে এই বোট দুটিকে কেটেছেঁটে নতুন যন্ত্রপাতি লাগিয়ে গানবোটে রূপান্তরের কাজ শুরু হয়। জাহাজের সামনে একটি এবং পেছনে একটি ৪০-৬০ বাফার গান বসানো হয় এবং পেট বরাবর উভয় পাশে প্রতিটি এক হাজার ১০০ পাউন্ড ওজনের মাইন বসানোর জন্য লাঞ্চিং ফ্রেম তৈরি করা হয়। এর আগে ফ্রান্স থেকে পালিয়ে আসা সাবমেরিনারদের নিয়ে পলাশীর আম্রকাননে কমান্ডো ক্যাম্প $C_2P$ প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছিলাম। ভারতীয় নৌবাহিনীর তৎকালীন কমান্ডার মণীন্দ্র নাথ সামন্ত ছিলেন এই ক্যাম্পের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক ও সমন্বয়কারী কর্মকর্তা। সমুদ্রবন্দর ও সমুদ্রপথে $C_2P$ ক্যাম্পের কমান্ডোদের সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করে যুদ্ধকে সমুদ্রেও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে $C_2H$ ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রয়োজনীয় অনুমোদন ও অর্থের ব্যবস্থা করেই পলাশ ও পদ্মা ক্রয় করা হয়।

যথাসম্ভব ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, কলকাতার তৎকালীন মেয়র প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ অথবা সেন, পদবি এখন ঠিক মনে পড়ছে না তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে রণতরী পলাশকে উদ্বোধন করেন। ভারতীয় নৌবাহিনীর লে. কমান্ডার জে কে রায় চৌধুরী (বীর চক্র) কমান্ডিং অফিসার নিযুক্ত হন। তাঁর আদি বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে। তবে পলাশের কোনো নতুন নামকরণ হয়নি। অবশ্য কমান্ডিং অফিসার নতুন নাম দিয়েছিলেন 'ভুলি নাই'। কিন্তু আমরা পলাশ বলতে অভ্যস্ত ছিলাম বলে ওই নামেই ডাকা অব্যাহত রইল, যা আজ পর্যন্তও আছে।

পদ্মা কমিশন হয় আরো সাত-আট দিন পর। পারুল ও পারিজাতকে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়এবং সেগুলোর জন্য বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে নৌ সেনাদের এনে নদিয়া জেলার কল্যাণী মডেল টাউনে একটি ক্যাম্প প্রস্তুত রাখা হয়।যুদ্ধ শেষে এই নাবিকরা ফিরে যান।

নভেম্বরের ১০ তারিখ জাহাজ দুটি বঙ্গোপসাগরে সার্থক অপারেশন করে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বিশ্ব সমাজের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়। এই দিন আমরা হলদিয়া থেকে বের হয়ে বঙ্গোপসাগরে মংলা বন্দরের চ্যানেলের প্রবেশমুখে 'ফেয়ার ওয়ে বয়া' ১ থেকে ৮, নম্বর পর্যন্ত বিস্তৃত চ্যানেলে আটটি এক হাজার ১০০ পাউন্ড ওজনের টর্পেডো আকৃতির মাইন সমুদ্রগর্ভে স্থাপন করি। ফেরার পথে 'MV City of Saint Albans' নামের একটি ব্রিটিশ পতাকাবাহী জাহাজ মংলা বন্দরের দিকে যাচ্ছিল দেখে তাকে আমরা ধাওয়া করি। VHF এ জাহাজকে সতর্ক করে ফিরে যাওয়ার জন্য বলা হয়। কিন্তু জাহাজ গতি পরিবর্তন না করায় আমরা জাহাজের প্রতি মেশিনগান ও বাফারের গোলা নিক্ষেপ করে সন্ত্রস্ত করে জাহাজটিকে কলকাতার দিকে যেতে বাধ্য করি। পরদিন সব ভারতীয় ও বিদেশি পত্রিকায় গোলার আঘাতের চিহ্নসহ জাহাজটির ছবি ছাপা হলে আন্তর্জাতিক মহলে সাড়া পড়ে যায়। দু-এক দিন পরেই ফেয়ার ওয়ে বয়ার কাছে এমভি ক্রাইসোভিলেন্দু, বার্লিএনসহ আরো একটি বিদেশি জাহাজ এবং পাকিস্তানি নৌবাহিনীর কনভার্টেড গানবোট পিএনএস তোফায়েলসহ মোট ছয়টি ছোট-বড় জাহাজ চ্যানেলে নিমজ্জিত হওয়ায় পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিকভাবে মংলা বন্দরকে বন্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। এর পরের ইতিহাস প্রায় সবার জানা।

আমার আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল পলাশ ও পদ্মার জন্ম, কর্মবিভ্রান্তি নিরসন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে তাদের অসামান্য ভূমিকার কথা প্রকাশ করা। আশা করি, তা করতে সক্ষম হয়েছি।

লেখক : মুক্তিযোদ্ধা
bhuiyanabdulhai@gmail.com

10-MAR-2015